MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২
দাম : দশ টাকা

কর্নেল তাহের : সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এক লড়াকু জীবন

[২১ জুলাই '২২ কর্নেল তাহেরের ৪৬তম ফাঁসি দিবস উপলক্ষে বাসদ কুমিল্লা জেলা শাখার উদ্যোগে ২৮ জুলাই কুমিল্লা টাউন হলে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান। তাঁর বক্তব্য কিছুটা সম্পাদনা করে ভ্যানগার্ডে ছাপা হলো।- সম্পাদক]

মাত্র ৩৮ বছরের জীবন কর্নেল তাহেরের। আর এই স্বল্প সময়ের জীবন যেন সংগ্রামের এক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যিক জীবনের কয়েকটা বিষয় শুধু আজকের আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আপনারা জানেন যে, কর্নেল আবু তাহের একটা সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে লড়াকু পথে চলতে চলতেই তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর এই গোটা জীবনজুড়ে গড়ে গেছেন সফলতা-ব্যর্থতা, ভুল-শুদ্ধমিলে অসংখ্য সংগ্রামের কীর্তি, যা আগামী দিনের বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা হয়ে আছে এবং থাকবে।

কৈশোর থেকেই সমাজ বদলের ভাবনায় বিভোর ছিলেন তাহের

এই বিপ্লবী চিন্তা তাঁর মধ্যে গড়ে উঠল কীভাবে? তারও একটা ইতিহাস আছে। পরাধীন দেশে সমাজের চারিদিকে অনাচার, অবিচার, শোষণ চলছে, তাঁর মধ্যে একটা যৌক্তিক প্রতিবাদী শক্তি তৈরি করা, একদিকে পরাধীনতার গ্লানি দূর করে এই শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে কী করে সমাজকে মুক্ত করা যায়, এই চিন্তা থেকেই তাঁর মধ্যে একটা সমাজ ভাবনা তৈরি হয়েছিলো। বড় বোন ছিলেন ময়মনসিংহ শহরের মোমিনুন্নেছা কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি। করতেন বামপন্থি রাজনীতি। সেখান থেকেই বামপন্থি রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা পান তিনি। তখন তিনি মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়া করতেন। তারপর থেকেই তার ভাবনা আরও অগ্রসর হয়। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এমএ ক্লাসের প্রথম পর্বে পড়ছেন, তখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান–এই ধরণের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলে নির্বিঘ্ন একটা আরাম আয়েশের জীবনযাপন করা যাবে এটা ঠিক কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সমাজের যে আধোগতি, আমি কি এর মধ্যে বাস করবো নাকি এটাকে পাল্টাবো? সেখান থেকে তিনি ভাবলেন যে, এটা পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু পরিবর্তন তো আমি চাইলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে না। ইতিহাসের কিছু শিক্ষা, বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারতে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামসহ দুনিয়ার দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন, জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস, সেগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা তিনি করেছেন।

নিজের এবং দেশের মর্যাদা রক্ষায়ই যোগ দেন সেনাবাহিনীতে

একটা শোষণের ব্যবস্থা যখন কায়েম হয়ে যায়, শোষক শ্রেণি এর থেকে লাভবান হয়। একটা কায়েমী স্বার্থ তৈরি হয়। এরা স্বেচ্ছায় একে ছেড়ে দেবে না। এদেরকে রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা থেকে, ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, আজ হোক কাল হোক, একটা সময় জনগণকে সাথে নিয়ে একটা যুদ্ধে আমাদের নামতে হবে। এই ধরণের ইতিহাস (দেশে দেশে বিপ্লবের ইতিহাস) থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ভাবলেন, যদি কোনদিন এ ধরণের যুদ্ধে নামতে হয়, তাহলে তার জন্য প্রশিক্ষণ লাগবে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ না করে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিলেন। সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি যে একটা বড় অফিসার হবেন, আরাম আয়েশের জীবনযাপন করবেন এমন চিন্তা তাঁর ছিলো না। নজরুলের গানে আছে–'এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল'। এমন একটা ভাবনা থেকে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যদি তা না হতো, তাহলে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে এসে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না। তাহলে এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন, যে প্রচলিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিরাপদ আরাম আয়েশের জীবন বা সামরিক বাহিনীতেও পদ পদবি লাভ করে নিশ্চিত জীবনযাপন করতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনে প্রতিমুহূর্তেই এর উল্টো ছবি আমরা দেখতে পাই।

সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে, সে সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মনে করা হতো বাঙালিরা যুদ্ধের জন্য বা সামরিক কাজের জন্য সক্ষম নয়। গোটা সশস্ত্র বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবিদের সংখ্যা ছিল ৮০ ভাগ আর বাঙালিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ ভাগ। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে মাত্র ২টি ব্যাটালিয়ন ছিল। তখন পাঞ্জাব ও বেলুচ রেজিমেন্টে ৩০টি করে ব্যাটালিয়ন এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টে ২০টি ব্যাটালিয়ন ছিল। বাঙালিদের দুটি রেজিমেন্টেও শতকরা ৫০ ভাগ পাঞ্জাবি সেনা সদস্য ছিল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রের পাশাপাশি পূর্ব-পশ্চিমের এই বৈষম্যমূলক অবস্থা কর্নেল তাহেরকে জাতিগত অধীনতা বুঝতে সহায়তা করেছিল। একই সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতা এবং দক্ষতার নজির রেখে তিনি প্রমাণ করেছেন বাঙালিরা দুর্বল জাতি নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবস্থা বদলের গেরিলা জনযুদ্ধে পরিণত করতে চেয়েছিলেন

কর্নেল তাহের পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার পর যুদ্ধের একটা সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি আরো কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা ও সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে বললেন, 'পাকিস্তান আর্মির মতো একটা অ্যাডভান্সড আর্মির সঙ্গে গেরিলা ওয়ার ফেয়ার ছাড়া আর কোনভাবে আমরা পারবো না। আমি হিসাব করে দেখেছি সাত আট মাসের মধ্যে কৃষক, ছাত্রদের নিয়ে প্রায় ২০ ডিভিশনের একটা বিরাট গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা যায়। এতে করে ভারতীয় আর্মির ওপর আমাদের নির্ভরতাও কমবে। আমি এটাও স্ট্রংলি ফিল করি যে, আমাদের সেক্টর কমাণ্ডারদের হেডকোয়ার্টারগুলো ইন্ডিয়ার মাটি থেকে সরিয়ে যতটা সম্ভব বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার। ফাইনালি আই অলসো ফিল দ্যাট উই স্যুড হ্যাভ মোর কন্টাক্ট উইথ দি স্পন্টেনিয়স ওয়ার লর্ডস' (ক্রাচের কর্নেল, শাহাদুজ্জামান, পৃ. ১১৮)। ভারতের মাটিতে বসে আমরা যুদ্ধ করতে চাই না। এই যুদ্ধটা হওয়া উচিত দেশের ভিতর থেকে। প্রথমদিকে অনেকে এই কথার পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ওসমানী সাহেবের কাছে গিয়ে কথাটা পেশ করার প্রস্তাব এলো, তখন তারা থাকলেন না। জেনারেল ওসমানী সাহেব এটা অনুমোদন করতে পারলেন না এবং ভারতীয় বাহিনীরও একটা নেতিবাচক মনোভাব ছিল। কর্নেল তাহেরের প্রস্তাব অনেকটা এরকম ছিল যে, ভারত যদি আমাদের সাহায্যই করতে চায়, তাহলে আমাদের যেসব সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং বিডিআরের লোকেরা ছিল তাদেরকে দিয়ে দেশের ভেতরে প্রথমে ভৌগলিক-সামরিক গুরুত্ব বিবেচনায় এক দুইটা সেক্টর খুলে প্রাথমিকভাবে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাক-আপ দিলেই চলত। এবং এক পর্যায়ে আর না থাকলেও সমস্যা হতো না। কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথ তলায় স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিলো কিন্তু তারপর স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র ভারতের ভেতর নিয়ে নেওয়া হলো। কর্নেল তাহের তাঁর যুক্তিতে বলেছিলেন, আমরা এই সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছি, আমরা এদের চিনি। ওরা যেমন আমাদের জানে, আমরাও ওদের জানি। দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা গেলে আপামর সাধারণ কৃষক খেটেখাওয়া মানুষকে এই যুদ্ধে যুক্ত করা যেত। আদতে সেটি পরিণত হতো একটি সশস্ত্র গণবাহিনীর জনযুদ্ধে। কিন্তু সে সময়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী শক্তি সেটি চায়নি।

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কৃষক-শ্রমিকের বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী

১৯৬৫ সালে যখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে কর্নেল তাহের বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং 'মেরুন প্যারাসুট উইং' পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ সামরিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কি প্রাপ্ত না, এটা বড় কথা না। এই জনগণ যদি তাদের পাশে আমাদের দেখে এবং উৎসাহী তরুণ যুবক, যারা প্রকাশ্যে লড়াই করতে চায়, তাদের যদি আমরা প্রশিক্ষিত করি, জনগণ এই যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে। কিন্তু এটা ভারত চায়নি। তিনি তাঁর কথায় ভিয়েতনাম আর কোরিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি আমরা বাংলাদেশের ভিতরে সেক্টরগুলো নিয়ে যাই, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে, হাজার হাজার কৃষক, কৃষাণী নানা

মাত্রায় যোগ দিয়েছে। শ্রমজীবী জনগণ শামিল হচ্ছে। তারমানে লক্ষ কৃষকের বাহিনী তৈরি হয়ে যাবে। শহরে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের গেরিলা ইউনিট গড়ে উঠতে থাকবে। বিষয়টি লক্ষ্য করুন। তাহলে নিরস্ত্র জনগণ সশস্ত্র একটা হানাদার বাহিনীর হাতে শুধু জীবন দিচ্ছে না, ওরা লড়ছে। সম্মুখ সশস্ত্র প্রতিরোধ সেভাবে করতে পারছে না, কিন্তু গেরিলা প্রতিরোধের শক্তি গড়ে উঠছে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে, সর্বস্তরে। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং ভারতীয়রা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তারা ভেবেছিল, লক্ষ লক্ষ কৃষক যদি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে, তাদের হাতে অস্ত্র যায় এবং তারা যদি লড়াইয়ে নামে, তাহলে দেশ একদিন স্বাধীন হবে। কিন্তু ভারতীয়দের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ রাখা, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য পূরণ বা প্রবাসী সরকারের পক্ষে স্বাধীন দেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বামপন্থিদের হাতে চলে যেতে পারে। আওয়ামী লীগ নেতাদের একাংশ ভারতেই যুদ্ধের মতো বিপদে তাদের ফেলার জন্য ছাত্র-যুবকদের গালমন্দও করেছেন। আর কতদিনে দেশ স্বাধীন হবে, ভারতে কতকাল থাকতে হবে, দেশের সহায় সম্পদের কী হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত ছিলেন। অন্যদিকে দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধের জন্য প্রাথমিকভাবে ভারতের যতটুকু সহযোগিতা লাগে তা নিয়ে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ঘাঁটি ও সারা দেশে গেরিলা তৎপরতা চালানো শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হল না। এইভাবে তাহের-জলিল, জিয়াউদ্দিনদের রণকৌশল বাস্তবায়ন করা যায়নি।

১১ নং সেক্টর হয়ে উঠল প্রতিরোধের অনন্য দুর্গ

কর্নেল তাহের, মেজর জলিলসহ অনেক সাবেক সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকেরা বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে কয়েকটা লড়াই পরিচালনা করলেন। পরিকল্পনামতো নিজের সেক্টরটিকে সাজাতে শুরু করেন তাহের। প্রথমত, সেক্টরের হেডকোয়ার্টারটিকে তিনি নিয়ে যান যতটা সম্ভব সীমান্তের কাছে। তাহের তাঁর হেডকোয়ার্টার বসান পাকিস্তানিদের কামালপুর ঘাটির মাত্র ৮০০ গজের মধ্যে। মাঝখানে শুধু কয়েকটি ট্রেঞ্চ। শত্রু ঘাটির এত কাছে অন্য আর কোন সেক্টরের হেডকোয়ার্টার তখন নেই। তাঁর সেক্টরের যুদ্ধকে তিনি পরিণত করতে চান একটি জনযুদ্ধে। নিয়মিত বাহিনীর উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যত দ্রুত সম্ভব আরও বেশি সংখ্যক সাধারণ মানুষদের তিনি যোদ্ধায় পরিণত করতে চান। এমনকি নিয়মিত বাহিনীর ভেতরেও সেপাই আর অফিসারদের মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে চান তিনি। স্বাধীনতার এই যুদ্ধকে তিনি ক্রমশ ধাবিত করতে চান সমাজতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে। সেজন্য এই যুদ্ধের একটা রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করাও খুব জরুরি মনে করেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমি খোঁজ পেয়েছি কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা কৃষকদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার খাসি আর মুরগি খেয়ে চলে আসে। মনে রাখবে এভাবে গেরিলা যুদ্ধ হয় না। কৃষকের কাছে যে সহযোগিতা তুমি পাবে তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা করবে। যদি কোন কৃষকের গোয়ালে রাত কাটাও তাহলে সকালে গোবরটা পরিষ্কার করে দিও। যেদিন অপারেশন থাকবে না সেদিন তোমার আশ্রয়দাতাকে একটা ডিপ ল্যাট্রিন তৈরি করে দাও, তাদের সঙ্গে ধান কাটো, ক্ষেত নিড়াও। এভাবেই তুমি তাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে'। (ক্রাচের কর্নেল, শাহাদুজ্জামান, পৃ. ১২১) যোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর সেক্টরের সব কোম্পানি এবং প্লাটুনগুলোতে বেছে বেছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছেলেদেরকে পলিটিক্যাল কমিশার হিসেবে নিয়োগ দেবার চেষ্টা করতে থাকেন। মূলত, বামপন্থি ও বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছেলেদেরকেই তিনি একাজে নিয়োজিত করেছিলেন। প্রতিটি প্লাটুনে রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করেন তিনি। এভাবেই তাঁর সেক্টর স্বতন্ত্র ধারায় এগিয়ে যেতে থাকে।

যুদ্ধে আহত হয়েও লড়াকু মনোভাব হারাননি এক মুহূর্তের জন্যও

কামালপুরের সম্মুখ সমরে শেলের আঘাতে আহত হলেন। শেলবিদ্ধ হয়ে স্ট্রেচারে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সাথে থাকা এক সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'জার্নালিস্ট আমি বলিনি ওরা কখনো আমার মাথায় আঘাত করতে পারবে না। এই দেখো পায়ে লাগিয়েছে। মাই হেড ইজ স্টিল হাই, গো ফাইট দি এনিমি, অকুপাই কামালপুর বিওপি'। আহত রক্তাক্ত অবস্থায় ভাই বেলালকে বলেন, ওয়াকিটকিটা আমার মুখের সামনে ধরো। বেলাল ওয়াকিটকিটা মুখের সামনে ধরলে রক্তাক্ত শায়িত তাহের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন–'আমার কিছুই হয়নি, তোমরা ফ্রন্টে ফিরে যাও, যুদ্ধ চালিয়ে যাও... কামালপুর মুক্ত করতে হবে মনে রেখো। আমি মরব না, খুব দ্রুত চলে আসব তোমাদের কাছে। পাকিস্তানিদেরকে তোমাদের হারাতেই হবে। আমি যেন ফিরে এসে দেখি কামালপুর দখল হয়েছে আর ঢাকার রাস্তা পরিষ্কার'। (ক্রাচের কর্নেল; শাহাদুজ্জামান, পৃ. ১৫৩)

ভাই-বোনদের যুক্ত করে গড়ে তুললেন ব্রাদার্স প্লাটুন

কর্নেল তাহেরের চরিত্রে অনেকগুলো দিক আছে। তার পুরো পরিবারকে তিনি মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত করেছিলেন। এগারো ভাইবোনের মধ্যে আটজন সরাসরি যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের মধ্যে চারজন খেতাবপ্রাপ্ত। কর্নেল তাহের বীর উত্তম, আবু ইউসুফ খান বীর বিক্রম। বেলাল এবং বাহারও বীর প্রতীক। বাকিরাও তাদের সাথে যুদ্ধে থেকেছেন। নিজের বোন ডলিকেও ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিলেন, অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং অপারেশনে পাঠিয়েছেন। সে কারণে এই এগারো নম্বর সেক্টরকে বলা হতো ব্রাদার্স প্লাটুন। তাহলে খেয়াল করেন, তাঁর কিশোর বয়স থেকে বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষাজীবনে বা তারুণ্যের সময়ে এসে তাঁর পুরো জীবনের গতি পরিবর্তন করা, সমাজ ভাবনার সঙ্গে

নিজেকে যুক্ত করা এবং ধীরে ধীরে বিপ্লবী চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হয়ে সেটাকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া এবং সেভাবে গোটা পরিবারকে যুক্ত করে লড়াইয়ে নামা সবই একসূত্রে গাঁথা।

স্থানীয় জনসাধারণ, কৃষক-কৃষাণি হতে পারত গেরিলাদের আদর্শ শিক্ষক

স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী যখন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নামলো, সেই বিষয়ে কিছু কথা সময় থাকলে বলবো। তাহের এ বিষয়ে কী বলেছিলেন? বিশেষ করে সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিং-এ তিনি বলেছেন, তোমরা কৃষকদের মধ্যে থেকে তাদের সাথে নিয়ে যদি লড়াইটা করো, তাহলে ভারতীয় জেনারেলদের চেয়ে অনেক ভালো পরামর্শ এবং লড়াইয়ের কলাকৌশল এই মানুষেরা তোমাদের শিখিয়ে দিতে পারে। উদাহরণ কী? ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের বাহিনী পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী আমেরিকান সৈন্যদের সাথে লড়েছিলো। সেই আমেরিকান বাহিনী ভিয়েতনামকে নাপাম বোমা মেরে তছনছ করে দিয়েছিলো। কিন্তু ভিয়েতনামের জনগণের বাহিনী ভিয়েত কং'রা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং দুর্ধর্ষ যে বাহিনী, মার্কিন সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করতে গিয়ে যেসব কলাকৌশল ব্যবহার করেছিলো তাতে জনগণের উদ্ভাবন ও অংশগ্রহণ ছিল যা আপনারা এখন বিভিন্ন ডকুমেন্টারিতে বা ফিল্ম আকারে দেখতে পান। বুবি ট্র্যাপে–কীভাবে কৃষকরা চাষাবাদ করছে আবার জমির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অনেক দূরে একটা মুখ খোলা রাখছে। ওখানে গিয়ে তারা–একদিকে জমিচাষ করছে আবার অন্যদিকে রাইফেল কাঁধে প্র্যাকটিস করছে। আমেরিকানরা তো দূর থেকে দেখে ধেয়ে আসে, কৃষক গেরিলারা গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়, আমেরিকানরা ওদের খুঁজতে আসে আর ওরা সুড়ঙ্গ দিয়ে চলে আসে দুইশ ফিট পাঁচশ ফিট দূরে। সেখান থেকে গুলি করে শত্রু নিধন করে। বনের পথ দিয়ে যখন মার্কিন সৈন্যরা যায়, তখন গাছে লুকিয়ে থাকা গেরিলারা এক প্রান্তে টানা বাঁশের-কাঠের বর্শা ঢোকানো মাটি ভরা বস্তা ছেড়ে দেয়। তার আঘাতে মার্কিনিরা লুটিয়ে পড়ে। এ রকম অসংখ্য কৌশল জনযোদ্ধারা আয়ত্ত ও প্রয়োগ করেছিল। বাংলাদেশের জনগণও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে নানা কৌশল নিয়েছিল। তবে যুদ্ধ পরিচালনাটা ভেতর থেকে করা গেলে তা অনেক বেশি কার্যকর হতো। স্বাধীনতাকামী শহিদদের চেয়ে হানাদার দখলদারদের মৃত্যু সংখ্যা বেশি হতো। তারপরও মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার ৯ মাসের আঘাতে পর্যুদস্ত পাক হানাদার বাহিনী সমস্ত এলাকা থেকে গুটিয়ে আসছিল শহর ও ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে, আরও ৫/৬ মাস যুদ্ধ চললে ভারতীয় বাহিনীর প্রয়োজন হতো না। মুক্তিবাহিনীর হাতেই তাদের পরাজয় ঘটতো। এক্ষেত্রে পাক-ভারত যুদ্ধ এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ হয়তো উভয়েরই চাওয়া ছিল। কারণ মুক্তিবাহিনীর কাছে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলে পাকবাহিনীর একটি সৈন্যও জীবিত থাকতো না। কারণ মুক্তিবাহিনী জেনেভা কনভেনশনের ধার ধারতো না। পাকিস্তানি বাহিনী নাকে খত দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে, আর ভারতীয় বাহিনীও বিজয়ের পুরো কীর্তি হাতে নিতে সক্ষম হয়েছে। মিত্র বাহিনী নামে ঢুকে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান করলেও মিত্র বাহিনীর মর্যাদা রক্ষা করেনি। ভারতীয়দের কাছে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ মঞ্চায়িত হয়েছে। কর্নেল তাহের বলেছিলেন, জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এই যুদ্ধ কারো অনুদান নয়। এবং আমরাই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমাদের সামর্থ্যে, আমাদের লড়াইয়ে।

পাকিস্তান উপনিবেশবিরোধী প্রতিটি গণসংগ্রামে পুরোভাগে থাকলেও বামপন্থিরা নেতৃত্বে আসতে ব্যর্থ হল

মুক্তিযুদ্ধের কিংবা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করতে গেলে, বামপন্থিরা কিন্তু বারবার আসে। সেই ৪৮ সাল থেকে শুরু করে সমস্ত আন্দোলনে বামপন্থিরা মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা, এগারো দফার যে আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, সমস্ত আন্দোলনেই বামপন্থিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু কেন নেতৃত্বে আসতে পারলো না? একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থিরা কেন ব্যর্থ হয়ে গেলো? এর একটা সঠিক মূল্যায়ন দরকার। বিশদে না গিয়ে এই ইতিহাস খুঁজতে হবে ১৯৬৬ সালে। যখন ১৯৫৬ সালের রুশ-চীন বিতর্ককে কেন্দ্র করে '৬৬ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি চীনপন্থি ও রুশপন্থি পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে গেল। আমাদের দেশের বামপন্থিরা তৎকালীন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন কবলিত বাংলাদেশে কী করণীয় তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে গেলেন চীনপন্থা এবং মস্কোপন্থা নিয়ে। তাও যতোটা না মার্কসবাদ বনাম শোধনবাদকেন্দ্রিক মতাদর্শগত আলোচনা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি মেনে তার চেয়ে বেশি ছিল পক্ষ বিপক্ষ মেরুকরণ প্রক্রিয়া। প্রকৃত আদর্শগত সংগ্রামে দল বিভক্ত করার দরকার হয় না, প্রয়োজন ধৈর্য্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত যুক্তি ও নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট করণীয় কাজে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া। মানুষ সে সময়ে উপনিবেশিক পূর্ব বাংলার মুক্তির পথ খুঁজছে। তার পথনির্দেশ বামপন্থিদের কাছ থেকে পাচ্ছে না। মওলানা ভাসানী সেই নির্দেশনা পথে অবিচল থাকলেও তাঁর মূলশক্তি সব বামপন্থিরা তখন তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে। তিনি একা একটা প্রতিষ্ঠানের মতো দাঁড়িয়ে লড়ছেন। এই সুযোগে ছয় দফা দিয়ে বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তি সামনে চলে আসলো এবং তাদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো। সেই আলোচনায় আমরা আজ বিশদে যাচ্ছি না। কর্নেল তাহের যে কথাটা বলেছিলেন, দেশের ভিতরে সব সেক্টরের হেড কোয়ার্টার নিয়ে আসবেন। আর ভারত প্রসঙ্গে তার একটা বক্তব্য আছে। অনেকগুলো কথাই তিনি বলেছেন–যে ভারতের সাহায্য এই মুহূর্তে দরকার, কিন্তু সাথে সাথে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারত খুব খুশি মনে আমাদের শিশুদের, সাধারণ মানুষ আর সেনাদের খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত ছিলো কারণ ভারত

জানতো, এতে করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর কূটনীতির অঙ্গনে তাদের সম্মান ও ভাবমূর্তি বেড়ে যাবে। আর উপমহাদেশে তার আধিপত্য বিস্তারের নীতিও আরো সুদৃঢ় হবে। আসলে বাংলাদেশের ঘটনায় ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সবচাইতে বেশি লাভবান হয়েছিলো ভারত। যুদ্ধের ব্যাপারে এতোটুকু বলতে পারি, আমাদের অফিসার ও সৈনিকরা মূলত ভারতের ইচ্ছা মাফিক তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে বহুভাগে বিভক্ত বামপন্থিদের অবস্থা কি? বামপন্থিরা জনগণের পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে, এতে সন্দেহের কিছু নেই। কিন্তু সেই সময়ের বাস্তবতা হলো বামপন্থিরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে খণ্ডিতভাবে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, কেউ দুই কুকুরের লড়াই বলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, কেউ ভারতে গেলেও স্বতন্ত্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না। মস্কোপন্থি নামে পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টি '৭১ সালের মে মাসে দলীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিল। আওয়ামী লীগ প্রবাসে সরকার গঠন করল। আর দেশে গণহত্যা চালাচ্ছে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী। গড়ে উঠলো গণপ্রতিরোধ। ফলে শুরু হল জনযুদ্ধ, জনগণের লড়াই। তাহলে এটা ছিলো জনযুদ্ধ, জনগণের লড়াই। কিন্তু জনগণের লড়াই যে চলছে, সেই যুদ্ধে জনগণের বাহিনী জনগণের সাথে মিলে এই জনযুদ্ধকে সশস্ত্র জনযুদ্ধে পরিণত করে সেটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল বামপন্থিদের কাজ। দেশের ভেতর থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা মুক্তিবাহিনী বিশেষ করে এফ এফ বাহিনীকে যুক্ত করে তাহেরের চাওয়া মতো কৃষক-শ্রমিক-জনতার যোদ্ধা বাহিনী গঠন করে গেরিলা তৎপরতার পাশাপাশি ঘাঁটি এলাকাও গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু যদি ছেষট্টি সালে কমিউনিস্টদের এই বড় বিভ্রান্তি ও বিভক্তি না থাকতো এবং তারা যদি সংগঠিত থাকতেন তাহলে হয়তো এই চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করার জোর পাওয়া যেত। এরা তো অনেক জীবন দিয়েছেন, এরা লড়াই করেননি তা তো না। অনেকে বিভ্রান্তির কথা বলেন, তারা দুই কুকুরের লড়াই বলেছেন কিন্তু বিভিন্ন এলাকায় তারাই লড়াই করেছেন। কিন্তু গণজোয়ারের সেই সংগ্রাম তারা ধরে রাখতে কিংবা এগিয়ে নিতে পারেননি। যদি তারা সেভাবে দাঁড়াতে পারতেন, তাহলে মুক্তিবাহিনী পরবর্তীকালে যারা ট্রেনিং নিয়ে এসেছে কিংবা দেশের ভেতর ট্রেনিং নেয়ার চেষ্টা করছে, বিভিন্ন খণ্ড খণ্ডভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়েছে তারা সবাই বামপন্থি যোদ্ধাদের সাথে কাতারবন্দি হতেন এবং কর্নেল তাহেরের মতো অনেক সামরিক বাহিনীর, বিডিআর, পুলিশের যুদ্ধে যোগ দেয়া সৈনিকেরা দেশের ভেতর ঘাঁটি করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারতেন।

সেনাবাহিনীকে জনগণের বাহিনীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন

এর ফলে জনগণের একটা বিশাল সশস্ত্র লড়াইয়ের বাহিনী গড়ে উঠতো দেশের ভেতরে। সেটা হয়নি। তারপর যখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেলো, তখন কর্নেল তাহের বললেন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার অংশ আমরা ছিলাম, আমরা ভাড়াটে সেনা চরিত্র বিসর্জন দিয়ে গণমুক্তির বাহিনী হয়েছি। আর পাকবাহিনী ও তাদের দোসররা দখলদার খুনি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ধিকৃত হয়েছে। তাহলে, ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর দুইটি চেহারা। একটা হচ্ছে শোষক শ্রেণির পক্ষে জনগণের উপর নির্যাতন চালানো, বাইশ পরিবারের স্বার্থে মানুষ খুন করা এবং পাকিস্তানি শোষকদের স্বার্থে জনগণের উপর নির্যাতন চালানো বাহিনী। আর আমরা এক অংশ তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন ধরণ সবকিছু পরিত্যাগ করে কনভেনশনাল মার্সিনারি আর্মি থেকে জনগণের বাহিনী হয়ে গেলাম। স্বাধীন বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর এই দ্বিতীয় চরিত্রই থাকা উচিত ছিল। আমরা শোষক শ্রেণির বাহিনী হবো না, জনগণের উপর নিপীড়ন চালানোর বাহিনী হবো না। জনগণের উপর বোঝা হবো না। তাহের বলেন, জনগণ এবং আর্মির লোকেরা মুক্তিযুদ্ধে একসাথে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ শেষে তাদের বিচ্ছিন্ন করাটা ঠিক হবে না। আমি মনে করি সেনাবাহিনীর রিফর্ম করা দরকার। সিপাই আর অফিসারদের মধ্যে যে দাসসুলভ সম্পর্ক আছে তার অবসান ঘটানো দরকার। তাছাড়া আমাদের মতো একটা দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা শুধু শুধু ব্যারাকে বসে থাকবে এটা তো ঠিক না। দেশের এখন কত কাজ, দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সেনাবাহিনীর সদস্যদের পুরোপুরি যোগ দেয়া উচিত। তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী হবে জনগণের বাহিনী, গণবাহিনী। কিন্তু নেতৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে এবং রাষ্ট্র পুঁজিবাদী পথে পরিচালিত হলে তা হবার নয় এবং তাই হয়েছে। তাকে প্রথম এডজুটেন্ট জেনারেল করা হলো, তারপর কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে আসলেন। এসেই তিনি বললেন, আমরা জনগণের উপর বোঝা হতে পারি না। জনগণের নিপীড়ক বাহিনীর পরিবর্তে, জনগণের, গোটা দেশের উন্নয়ন স্বার্থে এবং সমস্ত দিক থেকে জনগণের সাথে থেকে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে এই সেনাবাহিনীকে কাজ করতে হবে। সেখানে তিনি লাঙ্গল বাহিনী গড়ে তোলেন। ওদের বললেন, তোমরা জমিতে যাও। ঐ সময় কৃষকের সাথে, শ্রমিকের সাথে মিলে আমরা যুদ্ধ করেছি, এখন স্বাধীন দেশ গড়ার জন্য ঐ কৃষক শ্রমিকের সাথে মিলে আমরা উৎপাদন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবো। জনগণের উপর বোঝা না হয়ে সেই বোঝা লাঘব করার জন্য জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা কাজ করবো। এইটা তো স্বাধীনতার পরের শাসকগোষ্ঠী চায় নাই। বা এই কথার সঙ্গে অন্যরা একমত হন নাই, যে কারণে তিনি তখন এটা বাস্তবায়ন করতে পারলেন না, বাঁধার সম্মুখীন হলেন। খেয়াল করে দেখেন, একদিকে একটা পা হারিয়ে আসছেন, আবার ব্রিগেড কমান্ডার পদে কুমিল্লায় এসেছেন এবং তার খেতাবও ছিলো। বীর উত্তম ছিলেন তিনি। প্রমোশন নিয়ে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারতেন। সেদিকে গেলেন না। ঐ যে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা, সেটা নিয়ে তিনি আবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন।

বিপ্লবী পার্টির খোঁজে কর্নেল তাহের

শোষণমুক্ত সমাজের যে স্বপ্ন তার মাথায় ছিলো, তা বাস্তবায়ন ঘটাতেই সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টির যে আন্দোলন তার সঙ্গে একটা যোগাযোগ তার হয়েছিলো। সিরাজ সিকদার স্বাধীনতা যুদ্ধেও বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন। বরিশালের পেয়ারা বাগান থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও রণনীতি তিনি নিলেন সেটাকে কর্নেল তাহের ঠিক মনে করলেন না। কারণ, সিরাজ সিকদার পাকিস্তান আমলে বললেন, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ, কলোনি। এটা ঠিক ছিলো। কিন্তু স্বাধীনতার পর উনি বলে বসলেন যে, এখন ভারতের কলোনি হয়ে গেছে। কর্নেল তাহের এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারে নাই। মস্কোপন্থিরা গাঁটছড়া বেঁধে আছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে। তারা ভাবছেন শেখ মুজিবকে সঙ্গী করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন। তাহের সে আশা ছেড়েছেন আগেই তাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন ফায়দা নেই। কিছু চীনপন্থি যারা স্বাধীনতাকে মেনেই নেয়নি তাদের সঙ্গে যোগযোগও অর্থহীন। যোগাযোগ করেন প্রতিষ্ঠিত বামপন্থি মোহাম্মদ তোয়াহা, আবুল বাশার, সিরাজুল হোসেন প্রমুখ চীনপন্থি নেতাদের সঙ্গে। কিন্তু তারা বলেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে সংগ্রামের বা সংস্কার উদ্যোগের উপযোগী নয়। ক্ষমতাসীনরা রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর ভারতের দালালে পরিণত হয়েছে, তাই জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন এখনও অমিমাংসিত। এটা নিস্পত্তির পরও পুঁজিবাদ আরও খানিকটা বিকশিত হওয়ার পর সমাজতন্ত্রের ডাক দিতে হবে। দেখা করলেন বিশিষ্ট বামপন্থি নেতা বদরুদ্দীন উমরের সাথে। উমর সাহেব পড়াশোনা জানা মানুষ। তিনিও মার্কসবাদের নানা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝালেন দেশ এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে নেই। ক্রাচে ভর দিয়ে শহরময় ঘুরে তাহের খুঁজছেনে একটি দল, যার সঙ্গে তার চিন্তার মিল হবে। ছোট ভাই আনোয়ারকে একদিন বললেন, 'ভাবলাম সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটা পথ পাওয়া যাবে। ভেবেছিলাম সব বামপন্থিরা মিলে যৌথভাবে কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু সবাই তো যার যার পুকুরে সাঁতার কাটছে। আর সিনিয়র নেতারা সব থিওরিটিক্যালি কোন স্টেপ ভুল, কোনটা শুদ্ধ এই অঙ্ক করতে করতেই জীবন পার করে দিচ্ছেন। আমার মনে হয় পরিস্থিতিটাকে তারা খুব মেকানিক্যালি দেখছেন। তারা কেউ মনে করছেন না যে এ মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা সম্ভব' (ক্রাচের কর্নেল : শাহাদুজ্জামান; পৃ. ১৯৭)। সে সময়ে তার পরিচয় হয় সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। তার মাধ্যমে জাসদের বক্তব্যের সাথে পরিচিত হন। জাসদের যে বক্তব্য ছিলো, আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য, সেটা সঠিক মনে করে তিনি জাসদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন, অঘোষিতভাবে।

সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে আরও নিবিষ্টভাবে জড়িয়ে গেলেন জাসদ এর সাথে

মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিলকে যুদ্ধের পর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তার বিচারের দায়িত্ব পড়েছিল কর্নেল তাহেরের ওপর। মেজর জলিলের অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্রসহ সম্পদ লুটে নিচ্ছিল আর তাতে বাধা দিয়েছিলেন মেজর জলিল। এটা তাহের জানতেন। কিন্তু জলিলের এই ভারত বিরোধিতায় সরকারের অনেকেই অপছন্দ করেছিলেন, নাখোস ছিলেন ভারতীয় কর্মকর্তারাও। জলিলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আনা হয় খুলনার এক প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তাকে। যে যুদ্ধের পুরো সময় পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করে গেছে। সাক্ষ্য দিতে এলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেন তাহের। বলেন, 'দিস ইজ অ্যাবসার্ড। মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারের বিরুদ্ধে একজন যুদ্ধবিরোধী সাক্ষি দিতে পারে না। গেট আউট' (ক্রাচের কর্নেল; শাহাদুজ্জামান পৃ. ১৯১)। তাহের জলিলকে বেকসুর খালাস দেন। অল্প কিছুদিনের

মধ্যে জলিল তার চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে স্বাধীনতাত্তোর দেশের প্রথম বিরোধী দল জাসদে যোগ দেন। সে সময় জলিল তাহেরকেও আহ্বান জানান, স্যার, আপনিও চলে আসেন। আর্মিতে থেকে কী লাভ? তখন তাহের তাকে বলেছিলেন, 'জলিল, হাউ ফার ডু ইউ নো এবাউট মি? সময় বলবে সব। আই স্টিল ওয়ান্ট টু ট্রাই উইদিন দিস সিস্টেম' (ক্রাচের কর্নেল; শাহাদুজ্জামান; পৃ. ১৯২)। কিন্তু এর পরপরই তাহের এর উপলব্ধির পরিবর্তন হয়। কুমিল্লা ব্রিগেডে তাঁর কাজ অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারই পছন্দ হচ্ছিল না, একই সময়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা অভ্যুত্থান চেষ্টার খবর তিনি পান এবং শেখ মুজিবকে তা অবহিত করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তাকে বিশ্বাস না করে নিজের কাজে মনযোগ দিতে বলেন। কুমিল্লা ব্রিগেড থেকে তাঁকে বদলি করা হয় ডিরেক্টর ডিফেন্স পারচেজ হিসেবে। তাহের এটা সহজে মেনে নিতে পারেননি। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন যে, তাঁর একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় চলে এসেছে। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে আলাপ করেন তাহের। সবাই তাঁকে আরও ভাবতে বলেন। তাহের পরে স্ত্রী লুৎফাকে বলেন, ওদের লাইফে তো আর পলিটিক্যাল এজেন্ডা নাই। আর্মিতে ক্যারিয়ার করাই মূল ব্যাপার। আমার সাথে ওদের মিলবে না। আমি কিন্তু রিজাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। একটু কষ্ট হবে তোমার। এই লাইফে কি তোমার খুব মোহ জন্মেছে?' (ক্রাচের কর্নেল; শাহাদুজ্জামান; পৃ. ১৯৪) সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগের আনুষ্ঠানিক চিঠিটি তাহের জমা দেন ১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। পদত্যাগপত্রের শেষে তিনি লেখেন, 'আমি অনুভব করি ষড়যন্ত্র এখনো চলছে এবং আরও অনেকে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এই ধরনের ক্ষমতা দখল হচ্ছে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়া এবং এটাকে অবশ্যই রুখতে হবে।....এধরনের

সেনাবাহিনীতে আমার কাজ করা সম্ভব নয়। আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ একজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে নয় বরং একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, আমি এটাকে আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক বলে মনে করি। জনগণের স্বার্থই আমার কাছে সর্বোচ্চ। আমি সেনাবাহিনী ত্যাগ করে জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই, যারা মুক্তিযুদ্ধকালে আমার চারদিকে জড়ো হয়েছিল। আমি তাদের বলব কী ধরণের বিপদ তাদের দিকে আসছে' (অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্নেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি; আলতাফ পারভেজ; পৃ. ২১৩)। এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন, তিনি নদী ড্রেজিং আর সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন। গোপনে জাসদের সাথে যুক্ত থাকাকালীন তিনি পরিষ্কার বললেন, নদী-জমি, জনগণ–এই যে বাংলাদেশের সম্পদ, এই দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেন, পনেরো কোটি মানুষও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে, তা অসম্ভব নয়, যদি তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। ওসমানী সাহেব তখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তিনি তাহেরকে নারায়ণগঞ্জ ড্রেজিং সংস্থার ডিরেক্টর পদে যোগ দিতে বলেন। বাংলাদেশের নদী এবং বন্যা তাঁর আগ্রহের বিষয়, এ নিয়ে তিনি লিখেছেন 'সোনার বাংলা গড়তে হলে' লেখাতে। এরকম একটা বেসামরিক চাকরিতে থেকে রাজনীতির কাজে যুক্ত থাকাটা সহজ হবে বলে মনে করে তা গ্রহণ করতে রাজি হন তাহের।

মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল জাসদের ঘোষণায়

১০ এপ্রিল ১৯৭১, তখন যে প্রবাসী সরকার, তাজউদ্দীনের সরকার, সেই সরকার তিনটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়–সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। তারা ঘোষণা দেন, 'এই জন্যই আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করিলাম।' এই ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সংবিধানে লেখা হয়েছিলো–গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ হলো ভিত্তি যে নীতিতে দেশ পরিচালিত হবে। জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্র। সেটা কী? আজকাল আর এটা কেউ বলে না। গণতন্ত্র মানে কী? সকল মানুষের সম অধিকার। মানুষের ছয়টা মৌলিক অধিকার আছে–অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং কাজ। এই ছয়টা অধিকার যদি সকল মানুষের জন্য নিশ্চিত না হয়, তাহলে গণতন্ত্র পরিপূর্ণ হয় না। এই ছয়টা অধিকার যদি সকল মানুষ পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে না পারে, তাহলে তাকে সকল নাগরিকের জন্য স্বাধীনতা বলা যায় না। তাহলে যখন আমরা কোনো দেশকে স্বাধীন বলি, কোনো শাসনকে গণতান্ত্রিক বলি, তখন এই মৌলিক অধিকারগুলি সমস্ত মানুষের জন্য নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পরে মানুষের যে সীমিত অধিকার ছিলো সেটাও কমতে শুরু করলো। জনগণের ক্ষমতায়ন তো দূরে থাক, মানুষের অধিকার ক্রমে হরণ করা শুরু হলো। এবং ধনী-গরিব বৈষম্য বাড়তে শুরু করলো। যারা যত বেশি দরিদ্র তাদের মর্যাদা ততো কম। তাদের কথার কোনো গুরুত্ব নাই। তাদের মৌলিক অধিকারের কোনো নিশ্চয়তা নাই। এইভাবে যখন চলতে শুরু করেছিলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই কর্নেল তাহের জাসদের সাথে যুক্ত হয়ে জাসদের যে বিপ্লবী অঙ্গীকার ছিলো–যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি–তা বাস্তবায়ন করতে চান। যেভাবে দেশ চলছে, তা এক বিশ্বাসঘাতকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি বাস্তবায়ন করতে হয়–সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ....তাহলে, আরেকটা যুদ্ধ লাগবে, বিপ্লব করতে হবে। এই বিপ্লব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। কিন্তু এর দায়িত্ব শুধু কর্নেল তাহেরকে দিলে হবে না। কর্নেল তাহের তো জাসদের যে সিদ্ধান্ত, সেই মোতাবেক অগ্রসর হয়েছিলেন। তাহলে, জাসদ সেই সময়ের পুরো চিত্র কর্নেল তাহেরের সামনেও হাজির করে নাই, সারা দেশের নেতা-কর্মী, জনগণের সামনেও হাজির করে নাই। সেটা কীরকম?

৭ নভেম্বরের বিপ্লব চেষ্টার ব্যর্থতা এককভাবে কর্নেল তাহেরের নয়

আমি আগে বলেছিলাম, বামপন্থিরা কেনো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে আসতে পারলো না, এটা খুঁজতে হবে ছেষট্টি সালে গিয়ে। আর ৭ নভেম্বরের বিপ্লব চেষ্টা কেনো ব্যর্থ হলো এটা খুঁজতে হবে জাসদের জন্মলগ্নের ইতিহাসে বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চে গিয়ে। সেসময় চলছে লুটতরাজ, রিলিফের মাল চুরি হয়ে যাচ্ছে, শেখ মুজিব বলছেন, সাড়ে সাত কোটি রিলিফের কম্বল এসেছে তাহলে আমার কম্বল কোথায়? তারপর বিভিন্ন বক্তৃতায় বলা শুরু করলেন, 'সবাই পায় সোনার খনি, আমি পাইলাম চোরের খনি', 'সব চাটার দল, চেটেপুটে খেয়ে যাচ্ছে' ইত্যাদি। উনি বলছেন, কিন্তু বাস্তবতার বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নিতে পারছেন না।

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদ গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাসদ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ১টি মাত্র আসনে বিজয়ী ঘোষিত হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে তাঁদের নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও কমপক্ষে ১৮ থেকে ২৮টি আসনে বিরোধী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে আসতে পারতো বলে যে পরিস্থিতি পরিস্কার ছিল, তাকে আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস, কারসাজি ও ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী প্রভাব খাটিয়ে উল্টে দেয়। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে জাসদের ছাত্র সংগঠনের নিশ্চিত বিজয় নস্যাৎ করে দেয়। জাসদের অন্যতম সহসভাপতি বরিশালের ডা. আজহার উদ্দিনকে হাইজ্যাক করে নমিনেশন জমা দিতে দেয়নি। গোপালগঞ্জের এক প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করানোর তাগিদ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ন্যাপের কমলেশ বেদজ্ঞ ও তার প্রধান

প্রচার কর্মী সিপিবি'র জেলা সম্পাদক অলিউর রহমান লেবুসহ ৪ জনকে খুন করা হয়। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে আব্দুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ারের নিশ্চিত বিজয় ঠেকাতে ভোটের বাক্স হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এনে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে জিতিয়ে দেয়া হয়। বরিশালে জাসদ সভাপতি মেজর জলিলকে হারিয়ে আওয়ামী লীগের হরনাথ বাইনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। টাঙ্গাইলের ড. আলীম আল রাজিকে জালিয়াতি করে হারানো হয়। নির্বাচন পরবর্তী ১১-১৩ মে জাসদের জাতীয় সম্মেলন থেকে বলা হয়, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি আমরা বাংলাদেশে আর কোনোদিনও ঘটতে দেবো না। বাংলাদেশের বুকে এরপরে যদি আর কোন নির্বাচন হয় তো সেই নির্বাচন হবে মেহনতি জনতার নির্বাচন। শোষকগোষ্ঠীর ভণ্ড গণতান্ত্রিক নির্বাচন নয়'। জাসদ সারাদেশব্যাপী ২৭ মে গণবিক্ষোভের ডাক দেয়। নরসিংদীতে পুলিশের গুলিতে ৯ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়। সেই সময় জাসদের মধ্যে দুই ধরনের মতবাদিক প্রবণতা সামনে আসে। একটি হল শাসকদল যেভাবে গণবিচ্ছিন্ন ও জনসমর্থনহীন হয়ে পড়েছে এবং এখনও তার শ্রেণীগত সংহত অবস্থান ও মজবুত ক্ষমতা ভিত্তি তৈরি হয়নি, ফলে এখনই সরকার উচ্ছেদের ডাক দিয়ে সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া দরকার। অন্যটি ছিল জাসদ মূলত, এখনও সাংগঠনিকভাবে ছাত্র-যুবক শক্তি নির্ভর ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণিতে বিচরণশীল শক্তি। কিন্তু জাসদের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লণ্ঢবের মূল শক্তি শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের শক্তি সমাবেশ ঘটানো ও তাঁদের নিজস্ব সংগঠিত শক্তি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় জাসদের বিপ্লবী শ্রেণি ভিত্তি রচিত হওয়া দরকার। তাছাড়া জাসদ এখনও নিজেকে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল হিসাবে দাবি করার জায়গায় পৌঁছায়নি। দ্বিতীয়, মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফলে গ্রামে গ্রামে কৃষক বৈঠক করে রিলিফ কার্যক্রমের দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগের রিলিফ চেয়ারম্যানদের জবাবদিহিতা, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ, কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সুদমুক্ত কৃষি ঋণ প্রদান ইত্যাদি দাবিতে সংগঠনের কাঠামো বিস্তার ও হাজার হাজার কৃষক নিয়ে রিলিফ চেয়ারম্যানদের ঘেরাও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া কারখানা-প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা হয়েছিল। জাতীয়করণকে সমাজতন্ত্রের সাথে মেলানো হয়েছিল। জাতীয়করণ মানেই সমাজতন্ত্র নয়। জাতীয়করণ করতে হলে একটা কারখানার কী কাঁচামাল আছে, কী তার দায় দেনা আছে, কী উৎপাদিত পণ্য আছে এসব হিসাব জানতে হয়। একটা চায়ের দোকানও যদি জাতীয়করণ করতে হয়, তাহলেও জানতে হয় কী হাঁড়ি পাতিল আছে, কী টাকা-পয়সা দায়দেনা আছে ইত্যাদি। একে বলে অডিট (ইনভেন্ট্রি) কিন্তু কোনো কারখানাতেই সেভাবে অডিট হয় নাই। সব এক ধাক্কায় জাতীয়করণ হয়ে গেছে। শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা কারখানার প্রশাসক হয়ে গেলো। এরপর তারা দেদারসে লুটপাট শুরু করলো। সমস্ত জায়গায় লাল বাহিনী, নীল বাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন বাহিনী তৈরি করে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন শুরু করল। চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডে আর আর টেক্সটাইল মিলে ৮/১০ জন শ্রমিককে জবাই করেছিলো আওয়ামী লাল বাহিনী। এভাবে সারাদেশে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল। তখন জাসদের সিদ্ধান্ত ছিলো শিল্প কারখানাসমূহে লুটপাট, দুর্নীতি শ্রমিক নির্যাতন বন্ধের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা। কারখানা প্রশাসক ও সহযোগী দালাল শ্রমিক সংগঠনের বদলে সত্যিকার শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বশীল শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ঘেরাও করা। ঘেরাও করলে শ্রমিকদের মধ্যেও জাসদের একটা শক্তি গড়ে উঠবে। এভাবে শ্রমিক কৃষকদের ঐক্য গড়া। কিন্তু, এসময় আরেকটা বিষয় ছিলো। আজকে যে কালোআইন আমরা বলি, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, এসব আইন তখন করতে পারতো না। কেনো করতে পারতো না? আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে–'২৬। ১. এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। ২. রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে'।

সেই সময় আওয়ামী লীগ সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী আনে। এক নম্বর সংশোধনী হলো আলবদর, রাজাকার এরা মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে না। দুই নম্বর সংশোধনী হলো, বাংলাদেশের সংসদে যদি তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্য কোনো আইন পাশ করে, এটা যদি মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধেও যায়, তাহলে তা কার্যকর থাকবে। এভাবেই গণতন্ত্রের বুকে প্রথম ছুরি চালানো হলো। ঐ সংশোধনী না থাকলে বিশেষ ক্ষমতা আইন ইত্যাদি কালাকানুন নিয়ে আদালতে যাওয়া যেত। কালোআইন প্রণয়ন করতে পারতো না। কাউকে গ্রেপ্তার করতে ওয়ারেন্ট লাগে এবং গ্রেপ্তার করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী কোনো আদালতে হাজির করতে হয়। তার উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা যায় না। এটা হলো নিয়ম। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইন করার পর পুলিশ যদি কাউকে সন্দেহ করে, তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, আদালতে হাজির না করলেও চলবে এবং তাকে জামিন দেওয়াও নিষেধ। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই পুলিশের সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারাগারে রাখা যাবে। এখনও দেখেন, এই যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বিতর্ক করে। বিএনপি বলে, পুলিশ আমাদের মারে-ধরে, মামলা দেয়, কিন্তু ঐটা বলে না যে দুই নম্বর সংশোধনী আছে বলেই এটা সহজে করা যায়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি কেউই এটা বাতিল করার কথা বলে না। এটা বাতিল না করলে এমন আইন তো আইনি ছায়ার ছায়াতলে করতেই থাকবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন তৈরি করেছিলো আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিএনপি, জাতীয় পার্টি কেউ এটা বাতিল করে নাই। বরং তারাও নিজ স্বার্থে

ব্যবহার করেছে, নতুন নতুন কালাকানুনও তৈরি করেছে। ঐ সময় ১৯৭৪ সালে ১৭ মার্চ জাসদের পক্ষ থেকে এই দ্বিতীয় সংশোধনী ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসে একটা স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিলো। অর্থাৎ, মূলত তিনটা কাজ। কৃষকদেরকে সংগঠিত করে দুর্নীতিবাজ রিলিফ চেয়ারম্যানদের ঘেরাও করা; শ্রমিকদের নিয়ে দুর্নীতিবাজ মিল কারখানার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ঘেরাও করা এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কালাকানুনের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া।

১৯৭৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জাসদের ২৯ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। হরতাল থেকে এই দাবি পূরণে ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয় এবং তারপর ১২ দফাভিত্তিক আন্দোলনের কথাও ঘোষিত হয়। সেই ১২ দফার দুই নম্বর দফায় ছিল, 'কলকারখানার অসৎ প্রশাসন ও কর্মকর্তাদের ঘেরাও করা হবে। চার নম্বর দফায় ছিল, ধনী কৃষক-জোতদারদের ঘেরাও করা হবে, ৫ নং দফায় ছিল, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যানদের ঘেরাও করা হবে, ৭ নং দফায় ছিল, খাস জমি ও অতিরিক্ত জমি দখলের জন্য ঘেরাও করা হবে, ১১ নং দফায় ছিল, এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে গণভবন, সেক্রেটারিয়েট ও বঙ্গভবন ঘেরাও করা হবে'। ১৭ মার্চ পল্টনে জনসভার ডাক দেয় জাসদ। সেখানে এই ১২ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হওয়ার কথা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেয়ার কথা। তখন তারা খেয়াল করে নাই, মিটিং হবে বিকালে। তখন সেক্রেটারিয়েট তো বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে স্মারকলিপি দেবে কীভাবে? তখন বিপুল জনসমাগমের উত্তেজনায় ও অস্থিরতায় ভুগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে স্মারকলিপি দিতে মিছিল শুরু হলো। আর এতে ক্ষমতাসীনরা বলার সুযোগ পেয়েছে যে মন্ত্রীপাড়ায় জাসদ আক্রমণ করতে আসছে, তখন গুলি চালিয়ে কেউ বলে দশজন, কেউ বলে বিশজন মানুষকে হত্যা করা করা হলো। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হলো? এই যে জাসদের উপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসলো, জাসদের করণীয় ছিলো কী? তখন উচিৎ ছিলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা। মওলানা ভাসানীর মতো একজন মানুষ তখন দেশে ছিলেন। তাঁকে সামনে রেখে সমস্ত বামপন্থি দলগুলোকে নিয়ে যদি জাসদ সেদিন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতো, তাহলে ১৫ আগস্টে সামরিক অভ্যুত্থান না হয়ে গণ-অভ্যুত্থান হতে পারতো। হয়নি। কিন্তু জাসদ সেটা না করে কী করলো? গণবাহিনী গঠন করলো। অর্থাৎ সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী আর আওয়ামী বাহিনীকে আমরা সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করবো। এটা ছিলো ভুল সিদ্ধান্ত। এর ফলে জাসদ শাসকদের আক্রমণের মুখে পড়লো, আবার জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শুরু হলো।

এই জায়গা থেকে শুরু করলে ৭ নভেম্বরের ব্যর্থতার কারণ ধরা যাবে। রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি ছিলো বিপ্লবের পক্ষে, কিন্তু প্রস্তুতি ছিলো না। প্রস্তুতি না থাকার ফলে শোষকদের আক্রমণে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ঐ শিক্ষা নিয়ে কমরেড লেনিন ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করলেন। কেন একটা সফল হয়েছিলো, কেন আরেকটা ব্যর্থ হয়েছিলো, এগুলো আপনারা রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে জানতে পারবেন। এক, দুই, তিন, চার করে সব ব্যাখ্যা করা আছে। তাহলে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর যখন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো, অবজেক্টিভ কন্ডিশন অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা একটা বড় পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংগঠিত সৈনিক সংস্থা একটা আক্রমণে নামলো, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র, জনতা যদি রাজপথে নেমে যেত, যেটা রাশিয়াতে হয়েছিলো, তাহলে ঐ বিপ্লব ব্যর্থ হতো না, সফল হয়ে যেতো। ক্যান্টনমেন্ট হচ্ছে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমি। কাজেই একে ভাঙার জন্য সঠিক ভাবেই সৈনিক সংস্থা আঘাত করেছিলো। কিন্তু এটা টিকলো না, কেননা এর সমর্থনে বিশাল জনবাহিনী ছিলো না। যেটা ছিলো ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে। তাহলে এই পুরো দায় কি কর্নেল তাহেরকে দেওয়া যাবে? কিছু দায়িত্ব অবশ্য তাঁর থাকলেও ব্যর্থতার প্রকৃত ইতিহাস আমাদের বিপ্লবীদের খুঁজে বের করতে হবে।

প্রতিটি গণ-আন্দোলনই আগামী দিনের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের শিক্ষা রেখে যায়

কোনো দেশে বিপ্লব করতে চাইলে সেই দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস, তার বড় বড় যে সমস্ত ঘটনা, সফলতা, ব্যর্থতার ইতিহাসগুলি জানতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। আমাদের দেশে বিপ্লব করতে হলে ৫২-র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের শিক্ষা তো আছেই, ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন, নির্বাচন এবং তারপরে ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার পরে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান এবং ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থান–এই শিক্ষাগুলো লাগবে। স্বাধীনতা পূর্বকালে যেমন, শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দোলন করেছিলেন মওলানা ভাসানী। অসংখ্য কৃষক সমাবেশ করেছিলেন, গ্রাম পর্যায়ে আন্দোলনের বিস্তার ঘটাতে হাট হরতাল করেছিলেন–সেগুলোর কথা মনে রাখতে হবে। মওলানা ভাসানী সঠিক কর্মসূচি নিয়েছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্টরা–কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তাঁর পেছনে সেভাবে দাঁড়ায়নি, বা সেই অবস্থা তখন তাদের ছিলো না। সেজন্য তিনি পারেননি। আন্দোলন আওয়ামী লীগের হাতে চলে গিয়েছিলো। তারপর এমনকি আওয়ামী লীগের কাছ থেকেও শিক্ষা নেওয়া যায়, বিশেষ করে যখন শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। অর্থাৎ জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে জনগণকেই অত্যাচার করে যে শোষক শ্রেণি, তারা যাতে ঐ ট্যাক্স আর না নিতে পারে, তার জন্য জনমত সংগঠিত জনশক্তিতে জমাট বাঁধলো। কিন্তু সেটা তো তারা ধরে রাখতে পারবে না কারণ ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিরোধে তাদের আপসের পথেই হাঁটতে হবে। মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেই আপস আলোচনা চলছিল। বানের ঢল যেমন করে বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে

নেয় তেমনি জনগণের মুক্তির আকুতি আপসের দেয়াল চূর্ণ করে দিয়েছিলো। কিন্তু সামনে বিকল্প নেতৃত্ব আসতে পারল না। তারাই নেতৃত্বে থেকে গেলেন। জনযুদ্ধ শুরু হলো। এক্ষেত্রে কর্নেল তাহেরের শিক্ষাটা লাগবে, যে আমরা দেশের ভিতরে থেকে কেন এই যুদ্ধটা পরিচালনা করি নাই বা করতে পারলাম না? এক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী শক্তি আর সহকারী বিদেশি শক্তির শ্রেণিগত অবস্থান থেকে তাকে বুঝতে হবে।

ষড়যন্ত্র নয় গণ-অভ্যুত্থানের পথেই হাঁটতে চেয়েছিলেন তাহের

অনেকে বলে যে, পনেরোই আগস্টে শেখ মুজিবের সপরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাথে কর্নেল তাহেরের সম্পর্ক ছিলো। এটা অনৈতিহাসিক এবং মনগড়া। কর্নেল তাহের সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিলেন না। তবে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিলেন। আওয়ামী লীগের যে একদলীয় শাসন, এই শাসন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি এবং এটা একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা। এটাকে সামরিক বাহিনী দিয়ে নয়, জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমেই উচ্ছেদ করা সম্ভব। এবং সেই সময়ের আওয়ামী লীগ বা পনেরোই আগস্টে নিহত শেখ মুজিবের শাসন সম্পর্কে তার একটা সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন আছে সামরিক আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দিতে। সেখানে তিনি বলছেন, '১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার কী ভূমিকা পালন করেছে, তা দেশবাসী সবারই জানা। কীভাবে একের পর এক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করা হয়েছিলো এখন তা দলিলের বিষয়। এক কথায় বলা যায়, আমাদের লালিত সব স্বপ্ন, আদর্শ, মূল্যবোধকে একের পর এক ধ্বংস করা হচ্ছিল। গণতন্ত্রের অসম্মানজনক কবরশয্যা রচিত হয়েছিলো। মানুষের অধিকার মাটি চাপা পড়েছিল। আর সারা জাতির উপর চেপে বসেছিলো একটা ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র। ফ্যাসিবাদী নির্যাতনের গর্ভে ধীরে ধীরে জন্ম নিলো ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণপ্রতিরোধ আন্দোলন। এটা খুবই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক যে, এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের অন্যতম প্রধান পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান শেষ পর্যন্ত একনায়কে পরিণত হয়েছিলেন। অথচ মুজিব তার সংঘাতময় রাজনৈতিক জীবনে কখনোই স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে আপস করেননি। তিনি ছিলেন এককালে আমাদের গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতীক। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও তিনিই ছিলেন একমাত্র নেতা যে জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জনগণের মাঝে তার ব্যাপক ভিত্তি ছিলো। প্রতিদানে জনগণ তাকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। জনগণই মুজিবকে সম্মান এনে দিয়েছিলো, বহুগুণ করে তাকে নায়কের প্রতিমূর্তি দিয়েছিলো। আসলে জনগণ তাদের নেতা হিসেবে মুজিবকে তাঁদের মনমতো করে গড়ে নিয়েছিলো। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিব নামটি ছিলো জনগণের হুঙ্কার। মুজিব ছিলেন জনগণের নেতা। একথা অস্বীকার করার অর্থ সত্যকে অস্বীকার করা। তাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার শুধু জনগণেরই ছিলো। যে মুজিব জনগণকে প্রতারিত করে একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন তাকে জনগণের শক্তি দিয়ে মোকাবিলা করাটাই হতো সবথেকে ভালো। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যে জনতা মুজিবকে নেতার আসনে বসিয়েছিলো, সেই জনতাই একদিন মুজিবকে উৎখাত করতো। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত করার অধিকার তারা কাউকে দেয় নাই (সামরিক আদালতে প্রদত্ত কর্নেল তাহেরের জবানবন্দি; অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্নেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি; আলতাফ পারভেজ, পৃ. ২২৭)।' আজকে জাসদ কি কর্নেল তাহেরের এই বিশ্লেষণকে সঠিক মনে করে? কর্নেল তাহের এক বুর্জোয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে আরেক বুর্জোয়াকে ক্ষমতায় বসানোর রাজনীতি করেন নাই। সিরাজ সিকদারও করেন নাই। কিন্তু সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর তার পরিবার এবং সমর্থকদের অনেকে হলো বিএনপি আর কর্নেল তাহেরের মৃত্যুর পর তার পরিবারের এবং অনুসারীদের অনেকেই হলো আওয়ামী লীগ। কর্নেল তাহের তো এই রাজনীতি করেন নাই। তিনি শোষক শ্রেণির উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরে যদি কর্নেল তাহের এই উদ্যোগ নিতেন, তাহলে সিরাজ সিকদারের পরিণতি পেতেন আর সিরাজ সিকদার যদি বিএনপি-র আমলে উদ্যোগ নিতেন তাহলে কর্নেল তাহেরের পরিণতি বরণ করতেন। শ্রেণির এই বিষয়টা আমাদের একটু মাথায় রাখা দরকার।

জাসদ রাজনীতির ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই গড় ওঠে বাসদ

কর্নেল তাহেরের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার মধ্যে যে ভুল, এটা জাসদ রাজনীতির ভুলের অংশ। জাসদ রাজনীতির সূচনাকাল থেকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমিমাংসিত ভুলের ভুল উপলব্ধি জমে জমে পাহাড়সম বাধা তৈরি করেছিল যার খেসারত অনেক কঠিন মূল্যে দিতে হয়েছে। আমাদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, তারপরেও যতটুকু বুঝেছিলাম ততটুকু সংগ্রাম আমরা করেছি। এক পর্যায়ে আমরা জাসদের রাজনীতি ত্যাগ করে কেনো বাসদ করলাম, তার যৌক্তিকতা দিনে দিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। কারণ জাসদের কোন অংশই আজ আর জাসদ এর জন্মকালীন ঘোষণা কিংবা অঙ্গীকার কোনটারই অবশিষ্ট রাখেনি। আমরা শিক্ষা নিয়ে অটল থাকার চেষ্টা করেছি। কর্নেল তাহের যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেটা বিপ্লবের জন্যই ছিলো। তবে যে ভুলটা হয়েছিলো, সেই ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে এখানে ভবিষ্যৎ বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল করা যাবে না।

ফাঁসির মঞ্চে শান্ত এবং অবিচল তাহের শিক্ষা দিয়ে গেলেন কীভাবে মরতে হয়

আমরা ক্ষুদিরামের কথা শুনেছি, সূর্যসেনের কথা শুনেছি। কীভাবে নিঃশঙ্ক চিত্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও স্পর্ধিত থাকতে পারেন, সে ইতিহাসের কথা আমরা শুনেছি। সেইরকম এক মহান বিপ্লবী চরিত্র কর্নেল তাহের। উনি যখন গ্রেপ্তার

হন, আমি তখন ঢাকায়, কেন্দ্রীয় কারাগারে। ওনার যখন ফাঁসি হয়, আমাকে তখন বদলি করা হয়েছিলো চট্টগ্রাম জেলখানায়। সাধারণত ফাঁসির আসামিদের অনেক টানা হেঁচড়া করে মঞ্চে নিতে হয়। উনি ফাঁসির দিন একদম শান্তভাবে মওলানাকে বললেন, 'তুমি জিয়াকে কলমা পড়াও। অপরাধ করলে জিয়া করছে। আমি কোনো অপরাধ, অন্যায় করি নাই। আমাকে কলমা পড়ানোর দরকার নাই।' এসব দেখে কারারক্ষীরা তো অবাক হবেই। উনি শান্ত স্বাভাবিকভাবে গোসল করলেন, জেলে একটা জামা গিফট পেয়েছিলেন, সেটা পড়লেন। আম কেটে খেলেন, গার্ডসহ অন্যান্যদের খাওয়ালেন। এরপর চা-সিগারেট খেয়ে বললেন আমি রেডি, আমাকে ধরার দরকার নাই। সেই খোঁড়া পা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি ফাঁসি মঞ্চে গেলেন। ফলে, সারাজীবন লড়াইয়ের মধ্যে যেমন বিপ্লবী চরিত্রের স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনকে অসম্মানিত করেন নাই। একজন বিপ্লবীর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেন নাই। যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রইলেন বিপ্লবীদের জন্য। এতো বিশাল এক মহাপ্রাণ। তাঁকে আমরা হারিয়েছি।

কর্নেল তাহেরের স্বপ্ন ও সংগ্রামকে ধারণ করেই আগামী দিনের বিপ্লবীদের পথ রচনা করতে হবে

যখন শুরুতে আমরা এই আলোচনাগুলো করেছিলাম, অনেকেই বলেছিলেন ৭ নভেম্বর তো ব্যর্থ। আমরা বলেছি যে, এই ব্যর্থতা থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। এটা তো বাস্তব ঘটনা। জনগণের যেই সংগ্রামী চেতনা তার মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা এই বিপ্লবী প্রচেষ্টায় নিহিত ছিলো, এটাকে কর্নেল তাহের বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই পথে আগাতে হবে, শিক্ষা নিতে হবে এখান থেকে। বুর্জোয়া শ্রেণির দারস্থ হয়ে, তাদের অনুগ্রহ গ্রহণ করে কর্নেল তাহেরকে স্মরণ করা যাবে না। ফলে সত্যিকার অর্থে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী যে সত্তা, সেটাকে আমরাই ধারণ করি, আমরাই তাঁকে সম্মান করি। কেনো করি? কারণ আমরা বিপ্লব করতে চাই। আমরা পরিষ্কার মনে করি, কর্নেল তাহের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো কাজ করেন নাই। বুর্জোয়া কোনো শক্তির দ্বারস্থ হন নাই। সেই জায়গায় এসে কোথায় ঘাটতি ছিলো? জাসদ রাজনীতির মধ্যে কী ঘাটতি ছিলো? সৈনিক সংস্থার গঠন ও পরিকল্পনার মধ্যে কী ঘাটতি ছিলো? ৭ নভেম্বর জিয়ার উপর নির্ভর করার মধ্যে কী ঘাটতি ছিলো? জিয়াউর রহমানকে শ্রেণি উর্ধ্বে কেন বিবেচনা করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সঠিকভাবে নেওয়া কেনো সম্ভব হয়নি, এগুলো তো ইতিহাসের শিক্ষা। কিন্তু কর্নেল তাহের যদি সেইদিন এইভাবে একটা উদ্যোগ না নিতেন, একটা বিপ্লব প্রচেষ্টায় নিজেকে যুক্ত না করতেন, তাহলে আমরা আজকে এই শিক্ষা কোথায় পেতাম? অনেক বড় ক্ষতির মুখে গিয়েও অনেক বড় সম্ভাবনা তিনি উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন। আর নিরীহ নির্বিঘ্ন জীবন, ভয়ে পালিয়ে থাকার নোংরা জীবন কোনোদিন কাউকে কোনো স্বপ্ন দেখায়? তারা কোনোদিন কোনো আদর্শকে বুকে ধরতে পারে? ইতিহাস তা বলে না। লড়াইয়ে নামতে হয়। মোকাবিলা করতে হয়। কখনো হারবো, কখনো এগোবো, কখনো পিছাবো। শেষ পর্যন্ত একদিন জয় আসবেই এবং প্রত্যেকবার আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু নত হওয়া যাবে না। শাসক শ্রেণির অনুকম্পায় টিকে থাকার চেষ্টা করা যাবে না। কর্নেল তাহের বলতেন, 'আমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু আমার স্বপ্নকে মারতে পারে না। এটা জনগণের স্বপ্ন। আজকে আমরা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারি। কিন্তু যেই বাংলার জনগণ লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই বাংলার জনগণ, তার স্বাধীনতার স্বপ্ন, সংগ্রাম, তার আকাঙ্ক্ষা মরতে দেবে না। যখন রায় হলো, জেলখানার এই ক্ষুদ্র কক্ষে হঠাৎ আওয়াজ উঠলো, তাহের ভাই লাল সালাম। সমস্ত জেলখানা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। জেলখানার উঁচু দেওয়াল এই ধ্বনিকে কি আটকে রাখতে পারবে? এর প্রতিধ্বনি কী পৌঁছাবে না আমার দেশের শোষিত মানুষের মনের মনি কোঠায়? শাসক- শোষক শ্রেণি সৃষ্ট শত বিভ্রান্তি বিপত্তি কি দেশের মানুষকে এই ঘটনা বিস্মৃত করতে পেরেছে? বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কর্নেল তাহেরের ঐ ধ্বনি সারাদেশের গ্রাম-গঞ্জের ঘরে ঘরে নিয়ে যাবে। আমাদের দেশের একজন গুণিজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আহমেদ ছফা একটা লেখা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, তাহের যে সমাজ প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিলেন, সেই আহ্বানের শ্যামের বাঁশী এই দেশের শোষিত বঞ্চিত মানুষের মন মগজে ঢেউ তুলবেই। তারা সংগঠিত হবেই। তারা জয়লাভ করবেই। যাদের অনিবার্য বিজয়ের ভরসা করে তাহের হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করতে পেরেছিলেন, তাদের সংগ্রামের জেদ এবং আকাঙ্ক্ষার আগুন আমরা যদি ধারণ করতে পারি, তাহলে খুবই ভালো কথা। যদি না পারি, তাহলে কালের ধুলোকাদায় আমাদের গড়াগড়ি খেতে হবে। কারণ ইতিহাস এবং সময়কে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের কারো নাই। তাহের যে কাজের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেই কারণ জয়যুক্ত হলেই তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে। ইতিহাস আমাদের পরিত্যাগ করবে কর্নেল তাহেরের স্বপ্নটা পরিত্যাগ করা হলে। আমরা পরিত্যাগ করি নাই, আমরা বিপ্লবের কথা বলি। রাজনৈতিক অঙ্গনে বামপন্থি বিপ্লবী রাজনীতির কথা বলি। ভুল-বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলি।

যৌথতার শক্তিই বুর্জোয়া আক্রমণকে পরাস্ত করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারে

কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী চরিত্রের আরেকটি দিক। রায় হওয়ার পর কারারক্ষীরা টানাটানি করছে সবাইকে নিয়ে যাবে, কর্নেল তাহেরকে নিয়ে যাবে কনডেম সেলে আর সবাইকে সাধারণ সেলে। মামলাটা ছিলো স্টেট ভার্সেস মেজর জলিলের নামে। ফাঁসি হলো কর্নেল তাহেরের। কারণ তারা জানতো এখানে মূল শক্তি তাহের, তাকেই শেষ করা দরকার। শেষ করলেই তারা নিরাপদ বোধ করবেন। যুদ্ধে পা হারিয়েও বীরোত্তম কর্নেল তাহেরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদান খুঁজে পাওয়া গেল না।

উনি বলছেন, সবাই আমার কাছে কয়েকটি কথা শুনতে চাইলো। প্রত্যেকের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছিল। মেজর জলিল, আ স ম আব্দুর রব থেকে শুরু করে অনেকেই ছিলেন। তো এর মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। আমি বললাম, আমি যখন একা থাকি, তখন ভয়, লোভ-লালসা আমাকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে। আমি যখন আপনাদের মাঝে থাকি, আমার সমস্ত ভয়, লোভ-লালসা দূরে চলে যায়। আমি সাহসী হই, বিপ্লবের হাতছানি পাই। সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করার একটা অপরিমেয় শক্তি আমার মধ্যে কাজ করে। তাই আমাদের একাকীত্বকে বিসর্জন দিয়ে আমরা সবার মধ্যে প্রকাশিত হতে চাই, সেজন্য আমাদের সংগ্রাম। যেটাকে আমরা বলছি যৌথতার সংগ্রাম। বুর্জোয়া আক্রমণ একাকী মানুষকে বিধ্বস্ত করে দেয়। আর মানুষ যখন যৌথভাবে এর মোকাবিলা করে, তখন বুর্জোয়া আক্রমণ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এই কথাটাই আমরা বলি। একা আপনি ভাববেন, একা বাঁচতে চাইবেন, একা কিছু লোভ-লালসা, স্বার্থ সুবিধা চাইবেন, আপনি আদর্শিক নৈতিক লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে যাবেন। আর নৈতিক, যৌক্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে যখন যৌথভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, তখন প্রতিক্রিয়ার সকল শক্তি পরাস্ত হবে। এই কথাটাই আমরা ধারণ করি।

বিপ্লব, বিপ্লবী সংগ্রাম আর জনগণের মধ্যেই খুঁজেছেন নিজেকে, ব্যক্তিস্বার্থকে বিলীন করেছিলেন সমষ্টির স্বার্থে

কর্নেল তাহের তার নিজের কোনো সম্পদ রেখে যান নাই। দেখেন, মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, পুরো পরিবার নিয়ে যুদ্ধ করলেন, খেতাব পেলেন, তারপরও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সহায় সম্পত্তি তিনি করেন নাই। তার সন্তানদের কথা তিনি বলেছেন, 'নিতু, যিশু এবং মিশুর কথা মনে পড়ে। কিন্তু আমার গোটা জাতি রয়েছে তাদের জন্য। আমরা দেখছি শত সহস্র মায়া মমতা ভালোবাসা বঞ্চিত উলঙ্গ শিশু। তাদের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় করতে চেয়েছি।' দেখেন, কী ধরণের একটা মনুষ্যত্ব বোধের কত উন্নত জাগ্রত রূপ হলে এমনটা বলা যায়। হাজার হাজার মায়া মমতা বঞ্চিত উলঙ্গ শিশু এবং এরা নানা বঞ্চনার শিকার। এদের কথা না ভেবে কেবল আমার সন্তানের কথা ভাববো? কর্নেল তাহের তা ভাবেননি। বলেছেন, গোটা দেশ তো রয়েছে। দেশের মানুষ দেশকে রক্ষা করবে, নিজেরা বাঁচার রাস্তা করবে, সেই সাধারণের মাঝে আমার সন্তানও থাকবে। আলাদা ভাবে নয়। সমস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে নিজে সুখে শান্তিতে থাকবো, সম্পত্তি গড়বো, সন্তানদের নিয়ে নিরাপদে থাকবো– কর্নেল তাহের তা করেননি। ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে তিনি মেজর জিয়াউদ্দিনের লেখা কবিতা পড়লেন–

'জন্মেছি সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলতে, কাঁপিয়ে দিলাম...
জন্ম আর মৃত্যুর দুটি বিশাল পাথর রেখে গেলাম
পাথরের নিচে, শোষক আর শাসকের কবর দিলাম
পৃথিবী, অবশেষে এবারের মতো বিদায় নিলাম।'

পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে এক অনন্য সাহসি বীর কর্নেল তাহের

কর্নেল তাহেরের এই যে বিপ্লব প্রচেষ্টা, এর ঘাটতিগুলো কী, দুর্বলতা কী, ব্যর্থতার কারণ কী সেগুলো জানার চেষ্টা করি আর সবচেয়ে বড় কথা এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় তাঁর যে সাধনা, যে সংগ্রাম আর মোকাবিলা করার যে সাহস, সেগুলো আমরা ধারণ করি। ফলে যদি আমরা সেই শিক্ষা নেই আর কর্নেল তাহেরের যে বীরত্বপূর্ণ শৌর্য গাঁথা এবং নিজেকে আদর্শের জন্য উৎসর্গ করা- সেগুলো সঞ্চারিত করতে পারি আর ঐ শিক্ষাটা যদি দেশবাসীর কাছে সঠিকভাবে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে বাংলাদেশে বিপ্লবের শিখা আবার জ্বলবে। একশ বছর, দুইশ বছরেও এই শিখা নির্বাপিত হবে না। ইতিহাসের অনেক ঘটনায় অনেক সময় লেগে যায়। ইংরেজরা দুইশ বছর রাজত্ব করে নাই এই দেশে? তাদের তাড়াতে অনেক সংগ্রাম অনেক ব্যর্থতার পর সফলতা এসেছে। এর মধ্যে অনেক দেশে বিপ্লব হয়েছে অসংখ্য বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু শেষ কথা কী? সমাজ বিকাশের নিয়মে সমাজ এগিয়ে যাবে। সময়ের দূরত্ব দিয়ে যতিচিহ্ন টানা যাবে না। প্যারি কমিউনের ব্যর্থতার শিক্ষা নিয়ে ৪০-৪২ বছর পর রাশিয়ায় বিপ্লব করেন লেনিন। আবার ষাটের দশকের যে বিচ্যুতি, নব্বইয়ের সমাজতন্ত্রের পথ থেকে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন ইতিহাসের শেষ কথা না। এই শিক্ষা নিয়ে আবার রাশিয়ায় হোক বা সারা দুনিয়ায় আগুন জ্বলা শুরু হবে এবং সেই আগুন জ্বলছে। যখন রাশিয়া সমাজতন্ত্রে ছিলো, তখন পূর্ব ইউরোপের সমস্ত দেশ স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলো। তারপরও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সরকার বলেছিলো, যার যখন ইচ্ছা সে তখন চলে যেতে পারে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দিয়েছিলো। আর আজকের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া কী করছে? ওই দেশগুলোকে আবার দখল করার চেষ্টা করছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদ মিলে এই সমস্ত এলাকা লুটপাট করে খাওয়ার ধান্ধা করছে। সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ দ্বন্দ্বে, তাদের যুদ্ধ উন্মাদনায় সারা পৃথিবী অস্থির। ঘটছে সামরিক অভ্যুত্থান, সামরিক অভ্যুত্থান বিরোধী গণবিক্ষোভ, তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আওয়াজে মুখরিত রাজপথ, বহু অঞ্চল-দেশ, ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে কোন কোন দেশে সমাজতন্ত্রীদের উত্থান এবং বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও হয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্থানের সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি ব্যাপক গণজাগরণ এবং তার মাধ্যমে শোষিত মানুষের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। আমেরিকার মতো দেশেও নিরানব্বই ভাগ বনাম এক ভাগের এই আন্দোলন একসময় মার খেয়ে গেছে। কিন্তু ঐটা তুষের আগুনের মতো জ্বলছে।

ইংল্যান্ডে এখন অস্থির শাসনব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের কথা উঠছে। ফ্রান্সে আওয়াজ উঠছে। স্পেনে আওয়াজ উঠছে। কালকেই সেখানে সমাজতন্ত্র হবে তা না। কিন্তু মানবজাতি বুঝতে শুরু করেছে যে পুঁজিবাদ যতদিন টিকে থাকবে, সাম্রাজ্যবাদ যতদিন টিকে থাকবে, আমরা ঘুরে ঘুরে এক বিপদ থেকে আরেক মহাবিপদে, এক সংকট থেকে আরেক মহাসংকটের দিকে ধাবিত হবো। আর প্রত্যেকটা সংকটে বুর্জোয়ারা জনগণকে তার মধ্যে ফেলে তাদের উপর অধিক মাত্রায় শোষণ চাপিয়ে সেখান থেকে মুনাফা করবে। তাহলে এ থেকে পরিত্রাণ কী? হয় সংকটকালে বুর্জোয়াদের উৎখাত করে দাও, শ্রমিক শ্রেণির রাজত্ব কায়েম করো, নাহলে তাদের শোষণ নিপীড়নে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও। সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দাও। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জার সরকারকে উৎখাত করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতা দখল করলো, আর নতুনভাবে যখন সংকট তৈরি হলো, রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি তখন এই বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে মানব মুক্তির রাস্তা তৈরি করলো। তাহলে দুনিয়ার দেশে দেশে ইতিহাসের এই শিক্ষা নিতে হবে যে পুঁজিবাদ সৃষ্ট সংকট মানেই হলো জনগণের উপর তার বোঝা বহু গুণ বৃদ্ধি পাওয়া। বেকারত্ব বাড়বে, কর্মহীনতা তৈরি হবে, আয় কমে যাবে এবং সমাজে অস্থিরতা দেখা দেবে। খেয়াল রাখবেন, শোষণ যত বাড়বে, সামাজিক বৈষম্য বাড়বে আর ভারসাম্য নষ্ট হবে। আপনি লঞ্চে কিংবা নৌকায় করে নদীতে যাওয়ার সময় যদি একপাশ বেশি কাত হয়ে যায়, তাহলে তো ডুবে যাবে। সমাজে বৈষম্য যখন বাড়ে, তখন সামাজিক অপরাধ বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সমস্ত জায়গায়। আজকে দেখেন, ঘরে ঘরে অশান্তি, হানাহানি, সংঘাত চলছে। এগুলো কিন্তু ঐ শোষণের ফলাফল। স্বামী স্ত্রীকে মেরে ফেলে, চোখ তুলে ফেলে, ভাই বোনকে হত্যা করে, নারীকে গণধর্ষণ করে তার জীবনের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ফেলে। বাপ ছেলেকে মেরে ফেলে, ছেলে বাপকে। আত্মহত্যায় বহু সম্ভাবনাময় জীবন অকালেই ঝরে যাচ্ছে। এসব আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। এগুলো কী? চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই–মানুষে মানুষে সংঘাত, সংঘর্ষ, খুনখারাপি–এইসব জিনিস হচ্ছে শোষণমূলক ব্যবস্থায় বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট সামঞ্জস্যহীনতার ফলাফলে সৃষ্টি হওয়া অপরাধ। সামাজিক বৈষম্য থেকে অপরাধ জন্মলাভ করে। মানুষের ঘরে খাবার থাকবে না, পুলিশ দিয়ে কি আপনি চোর ঠেকাতে পারবেন? পারবেন না। তাই চোরকে বলেন চুরি করতে, গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে। যদি একটা মানুষের মানবিক জীবনযাপন করার সুযোগ থাকে, সে কিন্তু চুরি করতে যাবে না। ঢাকার শহরে দশ বারো লাখ লোকের কোনো নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা নাই। এরমধ্যে পাঁচ ছয় লাখ মানুষকে অনিয়ম অবৈধ পথের খোঁজ করে বাঁচতে হচ্ছে। এখন এই যে বিষয়গুলো, ঘরে ঘরে অশান্তি ঢুকে যাচ্ছে। আপনি পরিবারে সুস্থ থাকতে পারবেন না, সমাজে সুস্থ থাকতে পারবেন না। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব সামাজিক দূরত্ব বাড়তে থাকবে। আমেরিকার অবস্থা কী খেয়াল করেন। আমেরিকায় গত পাঁচ ছয় মাসে শিশুসহ তিনশ'র মতো মানুষকে অনির্দিষ্ট অকারণে গুলি করে মারা হয়েছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মেরে ফেলছে, হাসপাতালে ঢুকে মানুষকে গুলি করে। কাকে মারে কেন মারে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকে না। কী ভয়ানক অবস্থা। যারা মারছে তারা মানসিক ভারসাম্যহীন। বলছে, তারা সাইকোপ্যাথ, সিজোফ্রেনিক। অর্থাৎ, পারিবারিক সামাজিক বন্ধন নাই, মানবতা বর্জিত পুঁজিবাদী দৌড়ে হারজিতের মরণ খেলা–এক ধরণের একটা অসুস্থ পরিবেশ। মানুষকে ডলার সম্পর্কে বাঁধা হয়েছে। আমেরিকায় প্রতিটি নাগরিকের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে। এটা নাকি তাদের নিরাপত্তার জন্য। নিরাপত্তা কি অস্ত্র থেকে আসে? নিরাপত্তা আসে মানুষের সাথে মানুষের মানবিক সামাজিক বন্ধনে। ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের কাছে অস্ত্র ছিলো শত্রু নিধনের জন্য কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ছিল স্বাধীনতার মুক্তি চেতনায় গড়ে ওঠা সামাজিক বন্ধন। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিষ্টান এগুলোর কোনো হিসাব ছিলো না। মানুষ এক পরিবারের সদস্যদের মতো মিলিত হয়ে গিয়েছিল। তাহলে মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধ, সামাজিক চেতনা ও সমসত্ব বোধ যতো জাগ্রত হবে, মানুষ মানুষের কাছে আসবে, মানুষের মাঝে মিলন সম্পর্ক তৈরি হবে, উন্নত মানবিক সম্পর্কের বন্ধন তৈরি হবে। আর মানুষের উপর শোষণ যত বাড়তে থাকবে, মানুষ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, স্বার্থপরতা তৈরি হবে। মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে। পুঁজিবাদী ভোগবাদ সৃষ্ট লোভ লালসা উন্নত জীবন লাভের সংস্কৃতিতে বিভোর করে না, কৃত্রিম উত্তেজনা, হতাশা, নেশাগ্রস্ততায় ডুবিয়ে দেয়। দেশে আশি লাখ কিশোর তরুণ মাদকাসক্ত। পর্নগ্রাফি বাড়ছে। চিন্তা করেন, আমাদের একটা শিশু ছোটবেলা থেকে মা-চাচি, জেঠি-খালা, ফুফু দাদী এই সমস্ত নারীদের পরিচর্যায়, তাদের স্নেহ-মমতায় বেড়ে উঠে। ফলে এই নারীদের যে মূর্তি তাদের ভাবমানসে অঙ্কিত হয়, যে সম্মান এবং তাদের স্নেহ-মমতার ভেতর দিয়ে যে মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে, আপনি পর্নগ্রাফির ভেতর দিয়ে সেই নারীকে উলঙ্গ করে হাজির করে দিলেন। তাহলে যে কিশোরটি বেড়ে উঠছে অসংখ্য নারীর স্নেহ-মমতা পেয়ে এবং তাদের প্রতি সম্মানবোধ নিয়ে, সে এখন নারীকে একটা ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখতে শিখছে। তাহলে এই ছেলের ভবিষ্যৎ কী আর গোটা সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কী? নারীর অধিকার বঞ্চনা, নারীনির্যাতন ইত্যাদি ভয়ানকভাবে বাড়ছে তার চেয়ে বড় কথা পুরুষদের মানসিক সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ কীভাবে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে তা ভাবার কি দরকার নাই? শুধু মোবাইল ফোন আধুনিক মেশিন ব্যবহার করে এরা কী শিখবে? পুঁজিবাদ মজুরি দাসত্বের সীমানায় আটকে রাখতে ও তাদের মুনাফার মানবযন্ত্র হিসাবে কাজে লাগার যে শিক্ষা তার বাইরে যেতে চাইবে না। তাই জ্ঞান মানে পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখার জ্ঞান, দক্ষতা মানে কর্পোরেট

হাউজের কর্মপরিচালনার দক্ষতা, সাফল্য মানে লোক ঠকিয়ে বা চাতুর্যে ব্যক্তির আরাম-আয়েস, অর্থ বিত্ত লাভের সাফল্য। সমাজের উন্নতির সাথে নিজের উন্নতি, সামাজিক

সুস্থতার সাথে নিজের সুস্থতা যুক্ত না করে পূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। কর্নেল তাহের সে সময় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে যে লড়াইটা করে গেছেন। সেখান থেকে লক্ষ কোটি তরুণদের আজকে উৎসাহিত হওয়ার কথা ছিলো, প্রাণশক্তি ফিরে পাওয়ার কথা ছিলো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের একটা লড়াকু মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বুর্জোয়ারা সেই সম্ভাবনা ধ্বংস করছে। তারা সামরিক বাহিনীকে গণবিচ্ছিন্ন করে ব্যবসায় নামিয়ে দিয়েছে, পুলিশকে–যেই পুলিশ রাজারবাগে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই করলো এবং জীবন দিলো, তাদের জনগণের বিরুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হল। যে বিডিআর যুদ্ধের প্রথম প্রহরে জানবাজি লড়াই লড়লো, তারা কেন প্রাণঘাতি বিদ্রোহে নামলো, আনছারদের কেন বিদ্রোহ করতে হচ্ছে? তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কর্নেল তাহের বলেছিলেন, জনগণের মুক্তির লড়াইতে অংশগ্রহণকারী বাহিনীকে জনগণের বাহিনী না করে শাসক-শোষকদের বাহিনীতে রূপান্তরিত করলে তার অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল ভোগ না করে উপায় নাই। পাকিস্তানিরা যেমন জনগণের উপর নিপীড়ন চালানো ও শোষণ ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য সশস্ত্র সামরিক শক্তিসমূহকে ব্যবহার করেছিলো, আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে এসেও আমরা সেই চিত্র কতটা পরিবর্তন করতে পেরেছি? কর্নেল তাহেরকে স্মরণ করা এবং তার জীবন থেকে শিক্ষা ও সংগ্রামকে সামনে রেখে আজকে আবার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। সেই উদ্যোগ সব জায়গা থেকে আসা দরকার। এই আহ্বান রেখে আমি আবারও কর্নেল তাহেরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং শিক্ষা নিয়ে আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশের যে বিপ্লব, তাকে সফল করার সংগ্রামে আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কর্নেল তাহের লাল সালাম। জয় সমাজতন্ত্র।